কালের কণ্ঠ
www.kalerkantho.com
দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২০২০-০১-১২,পৃষ্ঠা- ০২ (বিশেষ সংখ্যা)

শিল্পী : হানিফ পাপ্পু

বাকশাল

একের মধ্যে বহুর মিলন

● মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন

দীর্ঘদিন ধরে গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করে আসা বঙ্গবন্ধু হঠাৎ কেন বাকশালের মতো একদলীয় শাসনব্যবস্থা করতে গেলেন? আসলেই কি এটা ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার হাতিয়ার? কী ছিল বাকশালের মূল বিষয়? আসলেই কি বাধ্যতামূলক ছিল সামরিক বাহিনী, বিচারক, আমলাসহ সবাইকে দলের সদস্য হওয়া? বাকশাল কায়েম হলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াত বাংলাদেশ?

বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ বা বাকশাল নিয়ে সমালোচনা যত হয়েছে, তার অনেকটাই আবেগের বশে। কোনো সজ্ঞান তথ্যভিত্তিক বস্তুনিষ্ঠ আলোচনাই হয়নি এ বিষয়ে। জনমানুষের কল্যাণের জন্য, অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য বঙ্গবন্ধু মনে করেছিলেন বাকশাল করা দরকার। সারা জীবন জনমানুষের অর্থনৈতিক মুক্তিটাকে তাঁর রাজনীতির সর্বোচ্চ পর্যায়ে রেখেছেন। সংবিধান, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, শিক্ষানীতি—সব জায়গায় বারবার বলা আছে, বাংলাদেশে বৈষম্যের কোনো স্থান নেই। শহরের মানুষ, গ্রামের মানুষ সমান হবে। নারী-পুরুষ ভেদাভেদ থাকবে না। রাষ্ট্রের সম্পদে সবার সমান অধিকার। বলেছেন, শিল্প হবে; কিন্তু শিল্প গ্রামে বেশি হবে। বারবার বলেছেন গ্রামে যেতে হবে। যারা প্রতিবন্ধিতার কারণে অসুবিধাগ্রস্ত তারাসহ সব পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য সম-সুযোগ ও অধিকার সংবিধানেই নিশ্চিত করা হয়েছে।

আর এ জন্যই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। অবশ্য শেখ মুজিবুর রহমানের সমাজতন্ত্রের কিছু স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন বা চীনে সমাজতন্ত্র মানে হলো সব সম্পদের অধিকারী হচ্ছে সরকার। কিন্তু বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩ অনুচ্ছেদে বলা আছে, সম্পদের মালিকানা হবে তিন রকম : রাষ্ট্রীয়, ব্যক্তিগত এবং সমবায়ী। কাজেই বঙ্গবন্ধুর ধ্যান-ধারণার মধ্যে ব্যক্তি খাতের স্থান শুরু থেকেই ছিল। তাঁর সমাজতন্ত্রে ছিল সবার সমান সুযোগ। কিন্তু তাঁর তিন বছর সাত মাসের শাসনকালের শেষ দিকে দেখা গেল, যে আদর্শ নিয়ে সমাজতন্ত্র চাচ্ছিলেন সেটা হচ্ছে না। বৈষম্য বাড়ছে। আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটানো হচ্ছে। বিত্তবানরা আরো ধনী হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'তিন বছর সময় দাও। এই তিন বছর কাউকে কিছু দিতে পারব না।' কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্রে যাঁরা যেখানে বসেছিলেন, তাঁদের অনেকেই এসব ভুলে নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন দেখা গেল। ব্যবসা-বাণিজ্যে অতিরিক্ত মুনাফা করছে, অনেকেই টাকার পাহাড় গড়ছে। তখন তিনি বলতে শুরু করলেন, আমি নানা সূত্র থেকে চেয়ে চেয়ে আনি, আর চাটার দল সেটা খেয়ে ফেলে।

১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারি একটা রাজনৈতিক দল জন্ম নেয়। তাঁরা বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কথা বললেন বটে, কিন্তু কোনো বাছ-বিচার করলেন না। তাঁরা থানা আক্রমণ করেছেন, সংসদ সদস্যকে হত্যা করেছেন, জাতির পিতা সম্পর্কে বিশ্রী ভাষায় কটূক্তি করেছেন। ১৯৭৩ সালের ১ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার কথা। তাঁরা পথ রোধ করলেন। তিনি যেতে পারলেন না। তাঁরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর বাড়ি আক্রমণ করলেন। ইউএসআইএস (USIS) জ্বালিয়ে দিলেন। একটি সদ্যঃস্বাধীন দরিদ্র দেশে এ ধরনের কার্যকলাপ দায়িত্বজ্ঞানহীন নাশকতা ছাড়া আর কী!

'৭২-৭৪ সালে সারা পৃথিবীতে অর্থনৈতিক মহামন্দা। সব কিছুর তীব্র অভাব। তেলের দাম ব্যারেলপ্রতি চার ডলার থেকে ১২ ডলার হয়ে গেল। গমের দাম বেড়ে গেল আড়াই গুণ। এই সব কিছুর ঢেউ বাংলাদেশেও পড়েছে। বন্যার কারণে বাংলাদেশে শস্য উৎপাদনে বিপর্যয় হয়েছে। এভাবে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও অব্যবস্থাপনার কারণে ১৯৭৪ সালের অক্টোবর মাসে দুর্ভিক্ষ শুরু হলো। এর প্রেক্ষাপট আরেকটু বলা দরকার। যুক্তরাষ্ট্র পিএল ৪৮০-এর অধীনে বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশকে খাদ্য সাহায্য মঞ্জুর করে। মঞ্জুরির খাদ্য বিক্রি করে সরকার যে অর্থ পায় তার নাম পিএল ৪৮০ কাউন্টারপার্ট ফান্ড। বাংলাদেশে এ ফান্ড দিয়ে পোল্ট্রি বিপ্লব এসেছে। অর্থায়িত হয়েছে পল্লী বিদ্যুৎ। কিন্তু এই চুক্তির মধ্যে লেখা আছে যদি কোনো দেশ সমাজতান্ত্রিক কোনো দেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিক লেনদেন করে, তাহলে এই সাহায্য বন্ধ হয়ে যাবে। সমাজতান্ত্রিক কিউবার ফিদেল কাস্ত্রো বঙ্গবন্ধুর কাছে চাইলেন পাট। বঙ্গবন্ধুও রাজি হয়ে গেলেন। পররাষ্ট্র, পাট বা অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের তাকে বলা উচিত ছিল, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি আছে। কিউবাকে পাট দিলে খাদ্য বন্ধ হয়ে যাবে। কেউ তাকে শর্তটা মনে করিয়ে দেয়নি। খাদ্যশস্য নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দুটি জাহাজ আসছিল, সেগুলো তারা ফিরিয়ে নিয়ে গেল। সব মিলিয়ে ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষটা হলো। অমর্ত্য সেন বলছেন, খাদ্যের তেমন কোনো অভাব ছিল না, ব্যবস্থাপনার ঘাটতি ছিল। তবে বাসন্তীর বানোয়াট গল্প দিয়ে পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে করা হয়।

তাই বঙ্গবন্ধু '৭৪ সালে বেসামরিক শক্তির সহায়তায় সশস্ত্র বাহিনীকে মাঠপর্যায়ে নামালেন। তারা নামার ফলে ভালোর চেয়ে মন্দ হলো বেশি। আওয়ামী লীগের কেউ কেউ নানা অবৈধ কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল, আবার সেনাবাহিনীরও সবাই ধোয়া তুলসীপাতা না। রক্ষীবাহিনী নিয়ে তাদের একটা বড় ক্ষোভ ছিল। পাকিস্তানফেরত এবং মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে একটা বিরোধ তো ছিলই। এ নিয়ে তাদের সঙ্গে মাঠপর্যায়ে অনেক গণ্ডগোল হয়। শেষে তিনি সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নিলেন। প্রশাসনেও নানা দুর্বলতা এবং দলাদলি দেখা দেয়।

রাজনৈতিক অস্থিরতা, প্রশাসনিক দুর্বলতা, দুর্নীতি—সব মিলিয়ে বঙ্গবন্ধু মনে করলেন, চিরাচরিত পথে চলছে না। একমাত্র পথ হলো একটা ইউনিক প্ল্যাটফর্ম। বাকশাল করলে সবাইকে এক ছাতার নিচে আনা যাবে। গণতন্ত্রের কষ্টিপাথরে যাচাই করলে বঙ্গবন্ধুর এই পদ্ধতি হয়তো একদলীয় ব্যবস্থা। তবে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তায় আমার মনে হয়নি যে উনি একদল করে ফেলছেন। বঙ্গবন্ধু মনে করতেন, বাকশাল একের মধ্যে বহুর মিলন। বহুমতের অবকাশ এতে আছে। দুটি উপনির্বাচনও হয়েছিল : পটুয়াখালী আর কিশোরগঞ্জে। পটুয়াখালীতে পাঁচজনকে মনোনয়ন দিয়েছিলেন। তার চেয়ে বড় কথা, তিনি মনে করতেন এটা ছাড়া আপাতত কোনো উপায় নেই। তবে সব সময়ই তিনি বলেছেন, এটা সাময়িক ব্যবস্থা।

বাকশালের তিনটি দিক। রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক। এর রাজনৈতিক দিক এখন আর প্রাসঙ্গিক নয়। কারণ জাতির পিতা ছাড়া এটি কার্যকর হতে পারে না। বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করেছেন, ঢাকা থেকে সব মানুষকে প্রশাসনিক সেবা দেওয়া সম্ভব নয়। এটাকে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। তারই অংশ হিসেবে নভেম্বরে প্রতিটি প্রশাসনিক মহকুমাকে জেলায় রূপান্তর করলেন। ৬১টা জেলা হয়ে গেল। প্রশাসনের অনেকেই এতে ভুল বুঝলেন। তবে যে ৬১ জনকে জেলা গভর্নর নিয়োগ দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু, তার প্রায় অর্ধেকই কিন্তু আমলা। বাকি অর্ধেক রাজনীতিবিদ। আর এটা দুই বছরের একটা অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা। দুই বছর পর নির্বাচিত গভর্নর হবে। দ্বিতীয়ত, পরিষ্কারভাবে তিনি বলেছেন, জেলার ডেপুটি কমিশনারই হবেন মুখ্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা তথা প্রাদেশিক সরকারের চিফ সেক্রেটারির সমতুল্য। অর্থাৎ গভর্নর রাজনীতিক নেতৃত্ব দেবেন আর ডেপুটি কমিশনার হবেন প্রশাসনিক প্রধান। কাজেই এখানে ভুল-বোঝাবুঝির কারণ নেই। তবু ভুল বোঝানো হয়েছে।

আর অর্থনৈতিক কর্মসূচিটা হলো কৃষিতে বৈপ্লবিক সংস্কার আনা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেতের আইলে অনেক জমি চলে যায়। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি তিনি বলেছেন, 'আমি জমির আইল তুলে দেব। জমি একীভূত হবে, তাতে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষবাস করা যাবে। পাঁচ গুণ বেশি শস্য উৎপন্ন হবে।' বলেছেন, 'আপনারা ভুল বুঝবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব না। এটা সাময়িক ব্যবস্থা।' কিন্তু এটাতে চরম ক্ষতি হয়েছে। মানুষ মনে করেছে, আইল উঠে গেলে আমার জমির কোনো চিহ্নই থাকবে না। মানুষকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে, তোমাদের জমি নিয়ে যাচ্ছেন শেখ মুজিব। বঙ্গবন্ধু ভাবলেন, লাঙল যাঁর তিনি পাবেন পাঁচ ভাগের দুই ভাগ। ভূমিহীন শ্রমিক পাবেন এক ভাগ, জমির মালিক পাবেন এক ভাগ আর সরকারের কাছে একটা ভাগ যাবে, যেটা দিয়ে ব্যাপক জনকল্যাণমূলক কাজ হবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে। এই ছিল উৎপাদিত ফসলের বিভাজন। এই উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থা যদি টিকত, অন্য রকম বাংলাদেশ পেতাম আমরা। তাঁর মনে হয়েছিল, কিষান-কিষানিদের যদি দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করানো যায়, তাহলে তথাকথিত শহুরে ভদ্রলোকেরা দেশের আর তেমন ক্ষতি করতে পারবে না। মোটা দাগে এই ছিল বাকশালের দর্শন।

সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব বাকশালকে জোরেশোরে সমর্থন দিয়েছে। দেশেও মওলানা ভাসানী, মোজাফফর আহমেদ, মণি সিংহ, মোহাম্মদ তোয়াহা প্রমুখ জোরেশোরে সমর্থন দিয়েছেন। সাক্ষাতে দিয়েছেন, দিয়েছেন লিখিতভাবে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা লাইন দিয়ে বাকশালে যোগ দিয়েছেন। নিয়ম করেছিলেন, শুধু একটি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান সদস্য হবেন। ব্যতিক্রম হিসেবে উপ-সেনাপ্রধানও বাকশালে যোগ দিলেন। তবে বাকশাল নিয়ে সাংবাদিক মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ছিল। কয়েকটা খবরের কাগজ বন্ধ হলো। বঙ্গবন্ধু যদি মনে করতেন, মনে করা উচিত ছিল হয়তো যে খবরের কাগজ সীমিত করাটা ঠিক হচ্ছে না। এটা নদীর স্রোতকে রুদ্ধ করে দেওয়ার মতো, স্রোতটা আরো জোরে আসবে। আমার মতে, পত্রিকায় হাত দেওয়া ঠিক হয়নি। কিন্তু সরকারের কট্টর সমালোচক বলে পরিচিত হলিডের এনায়েতুল্লাহ খান স্বেচ্ছায় বাকশালে যোগ দেন। রাজনৈতিক নেতারা কমবেশি সবাই যোগ দেন। ১৫ সদস্যের নির্বাহী পরিষদ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। তাতে বঙ্গবন্ধুর আজন্ম সুহৃদ শেখ আব্দুল আজিজকে সদস্য করায় অনেক বাদ পড়া নেতা সংক্ষুব্ধ হন বটে।

অনেক বিশ্লেষকের দৃষ্টিতে বাকশাল করতে তিন বছর দেরি হয়ে গেছে। যদি '৭২-এ বাকশাল হতো তাহলে বিরোধিতাই হতো না। অনেকে মনে করেন, একটা নতুন দেশ, সবাই যুদ্ধ করেছে, সবাইকে নিয়ে দেশটা পরিচালনা করলে হয়তো ভুলভ্রান্তি কম হতো। তিন দল আওয়ামী লীগ, ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টি নিয়ে পরামর্শক কমিটি না করে সর্বদলীয় সরকার করলে নাকি ভালো হতো।

অনেকেই বলে থাকেন, তাজউদ্দীন আহমদের কথা শুনলে হয়তো ১৫ই আগস্টের মতো পরিস্থিতি এড়ানো যেত। কিন্তু এটার কোনো ভিত্তি নেই। আমার জানা মতে, একমাত্র রক্ষীবাহিনী নিয়ে আপত্তি করেছিলেন তাজউদ্দীন সাহেব। বঙ্গবন্ধুর অন্য কোনো নীতিতে তিনি আপত্তি তো করেননিই; বরং উৎসাহী সমর্থক ছিলেন। তিনিই প্রস্তাব করেছিলেন, কোনো ব্যক্তি খাত থাকবে না। রাষ্ট্রীয় খাতে সব চলবে। বাংলাদেশে তখন বেশির ভাগ মানুষ গরিব, শিল্প-কারখানা নেই। সেখানে কেবলই সমাজতন্ত্র হবে আর আমি বিশ্বব্যাংক থেকে, এডিবির কাছ থেকে পয়সা নেব না। বঙ্গবন্ধুর মনোভাব ছিল ভিন্ন। বঙ্গবন্ধু বলেছেন, 'ওরা আসুক। আমাদের দরকার আছে। শুধু অর্থনৈতিক সাহায্য না, আমাদের পরামর্শ দরকার আছে, প্রযুক্তির প্রয়োজন আছে। তবে অর্থ, পরামর্শ ও তথ্য-প্রযুক্তি আসতে হবে বাংলাদেশের শর্তে।'

আসলে প্রথম দিকে কিছু ভুল ছিল। বাকশাল করার মূল সমস্যা ছিল আইন-শৃঙ্খলা। প্রথম ভুলটা অস্ত্র সমর্পণে। জাতির পিতাকে অনেকে ধোঁকা দিয়েছে। যাদের কাছে ১০০ অস্ত্র ছিল ১০টা জমা দিয়ে তারা বলেছে সমর্পণ করলাম। অস্ত্র থেকে যাওয়া মানে দেশের মধ্যে একটা অশান্তির বীজ থেকে গেল। অস্ত্রধারী মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো একটা নিয়মিত বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া উচিত ছিল।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন গভীরভাবে ধর্মপ্রাণ মানুষ। ৭ই মার্চের ভাষণে বলছেন, 'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব; এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশাল্লাহ।' এ একেবারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসেছে। তবু দেশের খাতিরে, জনকল্যাণের খাতিরে ধর্মভিত্তিক দল নিষিদ্ধ করলেন। কিন্তু তাদের গোপন তৎপরতা বন্ধ হলো না। অন্যান্য হঠকারী রাজনৈতিক দল তো ছিলই। বাকশাল নিয়ে জনমনে বিভ্রান্তিটা তারাই ছড়িয়েছে। বাকশালের পক্ষেও যে জনমত গঠন করা প্রয়োজন, সেটা হয়তো বঙ্গবন্ধুর সহকর্মীরা বুঝতে পারেননি।

লক্ষ করার বিষয়, ১৯৭৪-৭৫ সালে বাংলাদেশে জিডিপির প্রবৃদ্ধি ছিল শতকরা ৭.৮ ভাগ। কারণ বঙ্গবন্ধু অনুপ্রাণিত করেছিলেন শস্য উৎপাদনে। কৃষিতে উৎপাদন বাড়ছিল। শিল্প-কারখানা গড়ে উঠছিল। ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ হয়ে যেত। অন্যদিকে বেসরকারি খাতও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্বব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকসহ অন্যরা বেশি বেশি করে আসত। ব্যাংকিং সিস্টেম এগিয়ে গিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের রাস্তাও আবার খুলে গিয়েছিল। বন্দরগুলো পরিষ্কার করে দিয়েছে রাশিয়া। মানে ক্ষেত্র একদম প্রস্তুত। অর্থনীতিতে বড় ধরনের পরিবর্তন চলে আসত।

কিন্তু বাকশালকে বাস্তবায়ন করার সুযোগ আর দেওয়া হলো না। পরিকল্পনা পর্যায়েই তাঁকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো। পুরোপুরি বাকশাল যদি বঙ্গবন্ধু করে যেতে পারতেন, তাহলে আজকের অবস্থানে হয়তো আমরা ১৯৮৫ সালের মধ্যেই চলে আসতাম।

লেখক : উপদেষ্টা, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি;
বঙ্গবন্ধুর একান্ত সচিব
অনুলিখন : পিন্টু রঞ্জন অর্ক